বেঙ্গল টাইমস

২১ এপ্রিল, ২০২৬

ISSN 2445 5657

bengaltimes.in

সম্পাদকীয়

রাম যদি সুমতি দিতেন!

বাংলা তুমি কার? সর্বত্রই প্রশ্নটা ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠছে। আগেরবার নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহরা হুঙ্কার ছেড়েছিলেন, ইসবার দোশো পার। অর্থাৎ, দুশো পেরিয়ে যাব। কিন্তু বাংলা বিজয়ের রথ এসে থেমে গিয়েছিল সাতাত্তর আসনে। পরের পাঁচ বছর বিরোধী পরিসরে সেভাবে পাওয়া যায়নি বিজেপিকে।

পঞ্চায়েতে বিজেপির পালে তেমন হাওয়া ছিল না। লোকসভা ভোটেও আসন কমেছে। ১৯ থেকে কমে হয়েছে ১২। তবে বাম বা কংগ্রেস যে সেই বিরোধী পরিসরে জায়গা পেয়েছে, এমন নয়। এবার তো বাম আর কংগ্রেসের জোটও হল না। ফলে, মালদা বা

মুর্শিদাবাদে যে পাল্টা ছড়াই দেওয়া যেত, তাও অনেকটা ফিকে হয়ে এল। ফলে, বাইনারি সেই তৃণমূল আর বিজেপি।

দুর্নীতি, সন্ত্রাস যেন তেমন বড় ইস্যু নয়। ঘুরেফিরে সেই হিন্দু–মুসলিম। দেশের প্রধানমন্ত্রী কিনা এমন সুর বেঁধে দিতে চাইছেন। কখনও বাংলাদেশ, কখনও রোহিঙ্গা, কখনও অনুপ্রবেশ। আসলে, দুর্নীতিকে ইস্যু করতে গেলে জবাব দেওয়ার দায়টাও যে থেকে যায়। কারণ, সিবিআই বা ইডি তদন্তকে কার্যত প্রহসনে পরিণত করেছে। তাছাড়া, উন্নয়ন নিয়ে গেলেও হাজার সমস্যা। নিজেদের ফাঁপা উন্নয়নের বুলি তেমন কাজ করবে না। অগত্যা, সেই ধর্ম। সেই রাম। রাম যদি এই অর্বাচীনদের একটু সুমতি দিতেন!

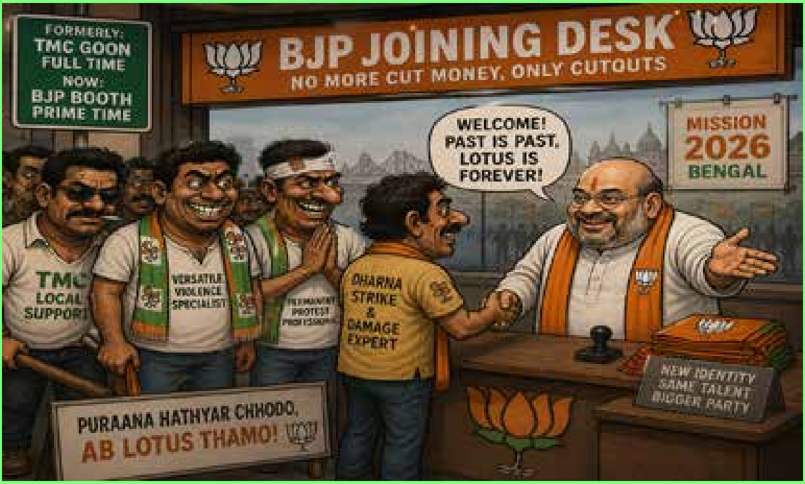

কোনটা গর্বের, কোনটা লজ্জার, গুলিয়ে যায়

স্বরূপ গোস্বামী

ভোটের বাজারে সবকিছুই কেমন যেন গুলিয়ে যায়। যে যা পারছেন, দাবি করে বসছেন। কেউ কেউ আবার প্রবল উৎসাহে হুঙ্কার ছেড়ে যাচ্ছেন। একেবারে উঁচু থেকে নিচু, অবান্তর কথায় বিশেষ ফারাক নেই।

যেমন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। গ্যারান্টি দেওয়ায় তাঁর কোনও বিকল্প নেই। এক দশকের বেশি সময় ধরে তিনি নানা গ্যারান্টি দিয়ে চলেছেন। প্রতিবারই ভোটের সময় নিয়ম করে আসেন আর হুঙ্কার দেন এবার সারদার অপরাধীদের জেল হবেই। সেই ২০১৬ থেকে এই ভাঙা রেকর্ড শুরু হয়েছে। কত নির্বাচন পেরিয়ে গেল, কত বছর পেরিয়ে গেল, এখনও এই ভাঙা রেকর্ডের কোনও বিরাম নেই।

এবার নতুন যোগ হয়েছে আরজি কর। অভয়ার মাকে পাশে বসিয়ে ঘোষণা করলেন, ‘এবার আরজি করের ফাইল খোলা হবে। অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া হবে।’ প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, আর জি করের ফাইল এতদিন কাদের হাতে ছিল? মর্মান্তিক সেই ঘটনার তিন চারদিন পরেই তদন্তের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছিল সিবিআইয়ের হাতে। কার্যত অশ্ব ডিম্ব প্রসব করা ছাড়া সিবিআই আর কিছুই করেনি। তাদের তদন্তের যা নমুনা, এই রাজ্যের সিভিক ভলান্টিয়াররা, তার থেকে ঢের ভাল তদন্ত করতেন। সিবিআইয়ের তদন্তে তো কোনও পাকিস্তান বা জঙ্গিরা বাধা দেয়নি। বিজেপির ভক্তরা মাঝে মাঝেই বলে থাকেন, তদন্তে প্রমাণ লোপাট হয়েছে। সেই প্রমাণ লোপাট কারা করল, সবাই জানে। শুধু সি বি আই জানে না। যারা প্রমাণ লোপাট করল, তারা অন্তত একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ছিল, তাদের কিছুই হবে না। সিবিআই তাদের স্পর্শ করতে পারবে না। দেখা গেল, সেই দুর্বৃত্তদের অনুমানই সত্যি। সিবিআই কার্যত কিছুই করল না। এই অভিযোগও শুধু বিরোধীদের নয়। বরং তিনি যাঁর হয়ে প্রচার করতে এলেন, সেই অভয়ার মায়ের। এখন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে মঞ্চে হুঙ্কার দিচ্ছেন, ফাইল খোলা হবে। নিজের ব্যর্থতাকে এভাবে উদযাপন প্রধানমন্ত্রীর চেয়ে ভাল আর কেউ করতে পারেন না।

এবার তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বেশ কয়েক মাস ধরে হুঙ্কার দিয়ে আসছেন, এই রাজ্যে কোটি কোটি অনুপ্রবেশকারী ঢুকেছে। তার জন্য দায়ী করছেন বর্তমানসরকারকেই।বর্ডারসামলানো

কাদের দায়িত্ব, সেটাই মাঝে মাঝে গুলিয়ে যায়। যদি সত্যিই কোটি কোটি অনুপ্রবেশকারী ঢুকে থাকেন, সবার আগে তো এমন কীর্তিমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদেয় করা উচিত। নিজের ব্যর্থতা নিজেও বোঝেন না! বলা হয়, রাজ্য নাকি জমি দিচ্ছে না। কতবার এই নিয়ে বৈঠক হয়েছে? রুদ্ধদ্বার কক্ষে এতবার এত আলোচনা হল, জাতীয় সুরক্ষার এই বিষয়টা নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি! জাতীয় সুরক্ষা নিয়ে এঁরা কতটা সিরিয়াস, বোঝাই যাচ্ছে। কখনও মতুয়াদের আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, একজন মতুয়ার নামও ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাবে না। অথচ বাদ যাওয়া মতুয়াদের সংখ্যা লক্ষাধিক। কয়েক মাস আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতিকেও কি বেমালুম ভুলে গেলেন।

এবার ভক্তদের কথায় আসা যাক। তাঁরা নিশ্চিত, এবার বিজেপির সরকার হচ্ছে। এমনকি যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাও আসে, তবু কোনও চিন্তা নেই। কারণ শ্রীমান অমিত শাহ আছেন। ১২০ আসন পেলেও বাকি প্রায় ৩০ খানা আসন জোগাড় করা নাকি কোনও ব্যাপারই নয়। তিনি নাকি ৩০ জন এম এল এ-কে তিনি নাকি 'কিনে নেবেন'। আহা, কী গর্বের কথা! দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, টাকা দিয়ে বিরোধী বিধায়কদের 'কিনে নেবেন।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সম্পর্কে কী চমৎকার শ্রদ্ধা! এমন প্রশংসা শুনে অমিত শাহ গর্বে আপ্লুত হতেই পারেন, কিন্তু এটা যে তাঁকে প্রকারান্তরে 'ডাকাত' বলা হল, এটুকু বোঝার বুদ্ধি, তাঁর অন্তত নেই।

এই মেরুকরণ ব্যুমেরাং হতে পারে

প্রশান্ত বসু

ভোটে অঙ্ক বড় একটা ফ্যাক্টর। কোন অঙ্ক কোথায় ক্লিক করে যাবে, কেউ বলতে পারবে না। বাংলা দখলের জন্য এবার জোর কদমে ঝাঁপাচ্ছে বিজেপি। তৃণমূল থেকে দল ভাঙিয়ে একের পর নেতাকে দলে নিচ্ছে। চিত্রতারকা থেকে খেলোয়াড়দের দলে টানার চেষ্টা করছে। এর মধ্যে হয়ত অন্যায় কিছু নেই। কিন্তু এসবের থেকেও যেটা বেশি করে করতে চাইছে, তা হল ধর্মীয় মেরুকরণ।

বিজেপি নেতারা যে ভাষায় কথা বলছেন তাতে পরিষ্কার, ধর্মের ভিত্তিতে ভোট বিভাজন করতেই তাঁরা বেশি আগ্রহী। মোদ্দা কথা, মমতাকে সংখ্যালঘু দরদি হিসেবে প্রতিপন্ন করো। মমতা সংখ্যালঘু তোষণ করছেন, মমতা জিতলে সংখ্যালঘুদের আরও বাড়বাড়ন্ত হবে, এই পশ্চিমবঙ্গ একদিন বাংলাদেশ হয়ে যাবে, এই মর্মে প্রচার চালিয়ে যাও। তাহলে, হিন্দুদের বড় অংশের ভোট বিজেপির বাক্সে পড়বে। লোকসভায় এই তাস খেলে বিজেপি কিছুটা সফলও হয়েছিল।

কিন্তু এবার সেই টোটকা বুমেরাং হয়ে ফিরে আসতেই পারে। সবথেকে বেশি সংখ্যালঘু মানুষ কোন কোন জেলায় বাস করেন? মালদা ও মুর্শিদাবাদ। পাঁচ বছর আগেই এই দুই জেলায় তৃণমূলের ফল অত্যন্ত খারাপই হয়েছিল। মালদার ১২ আসনের মধ্যে তৃণমূল একটিতেও জেতেনি। মুর্শিদাবাদের ২২টি আসনের মধ্যে জিতেছিল মাত্র চারটিতে। তার মানে, এই দুই জেলা মিলিয়ে ৩৪টি আসনের মধ্যে তৃণমূল জিতেছে মাত্র চারটি আসনে। তাহলেই ভেবে দেখুন, যে দল ২৯৪ এর মধ্যে ২১০ আসন পায়, সেই দল এই দুই জেলায় ৩৪ আসনের মধ্যে মাত্র চারটি আসন পায়। এই হিসেব থেকে পরিষ্কার, সংখ্যালঘু ভোট মানে সেটা তৃণমূলে যাবে, এমন কথার পেছনে কোনও যুক্তি নেই, অঙ্কও নেই।

কিন্তু বিজেপি ক্রমাগত তাঁকে মুসলিম দরদি বলে প্রচার করে চলেছে। মুসলিমদের নামে ক্রমাগত কটূক্তি করে চলেছে। এর ফল মারাত্মক হতে পারে। সত্যি সত্যিই মুসলিম ভোটের বড় একটা অংশ নিরাপত্তার জন্য তৃণমূল শিবিরে ভিড়তে পারে। তাদের মনে হতেই পারে, বিজেপিকে কেউ ঠেকাতে পারলে তৃণমূল পারবে। অতএব, তৃণমূলের পাশে দাঁড়ানো দরকার। আর হিন্দু ভোটের দিকে বিজেপির যতই লক্ষ্য থাকুক, হিন্দু ভোট কখনই এক জায়গায় পড়বে না। শাসক দল হিসেবে এমনিতেই কুড়ি–পঁচিশ পার্সেন্ট তৃণমূল পাবে। তার মানে মুসলিম ভোট যদি তিরিশ শতাংশের মধ্যে পঁচিশ শতাংশও পাওয়া যায়, আর হিন্দু ভোট বাকি পচাত্তর পার্সেন্টের মধ্যে পঁচিশ পার্সেন্ট। মোদ্দা কথা, অঙ্কের এই স্বাভাবিক নিয়মেই তৃণমূল জিতে যাবে। সুতরাং, এই মেরুকরণের বড় মাশুল হয়তো বিজেপিকেই দিতে হবে।

দেওয়াল লিখন স্পষ্টই ছিল

সুপ্রকাশ রাউত

বিহারে পালাবদল। হ্যাঁ, সে অর্থে পালাবদলই বলা যায়। কারণ, প্রায় দুই দশক ধরে মুখ্যমন্ত্রী থাকার পর এবার দায়িত্ব ছাড়লেন নীতীশ কুমার।

কখনও থেকেছেন বিজেপির সঙ্গে। কখনও লালুপ্রসাদ-কংগ্রেসের সঙ্গে। মাঝে ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে ফল খারাপ হওয়ায় নৈতিক দায় নিয়ে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। কয়েকমাস পরেই আবার স্বমহিমায় ফিরে এসেছিলেন।

বারবার শিবির বদল কখনই কাম্য নয়। বিশেষ করে এক দলের সমর্থন নিয়ে জেতার পর মাঝপথে সেই শিবির ছেড়ে অন্য দলের সমর্থনে ফের মুখ্যমন্ত্রী হওয়াটা মোটেই গৌরবের নয়। কিন্তু তারপরও বলতে হবে, বিহারে সুশাসন আনার ক্ষেত্রে নীতীশ কুমারের বড় একটা ভূমিকা আছে। লালুপ্রসাদ যাদবের সময় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির যথেষ্ট অবনতি হয়েছিল, এটা ঘটনা। নীতীশ কুমারের আমলে পরিস্থিতি বদলেছিল, এটাও ঘটনা। যে জঙ্গলরাজের জন্য বিহারের পরিচিতি, সেই জঙ্গলরাজ এখন অনেকটাই অতীত। প্রশাসনে অনেকটাই স্বচ্ছতা

এসেছিল। চোখে পড়ার মতো কিছু উন্নয়নও হয়েছে। অন্তত তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ নেই। ‘সুশাসনবাবু’ স্বীকৃতিটাও অর্জন করেছিলেন। মদ নিষিদ্ধ করার মতো সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, যা আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় অনেকটাই সহায়ক হয়েছে। বিশেষ করে গার্হস্থ অশান্তি অনেকটাই কমেছে।

যেভাবেই হোক, বিজেপি চাইছিল বিহার দখল করতে। কিন্তু নিজেদের কৃতিত্বে তা সম্ভব ছিল না। তাই নীতীশ কুমারকে সামনে রাখা দরকার ছিল। এটা মোটেই বিজেপির উদারতা ছিল না। বরং কৌশলই ছিল। ছয় মাস যেতে না যেতেই তাঁকে রাজ্যসভায় পাঠিয়ে বিহার দখল হল। কয়েক বছর পর নীতীশ কুমারের দলটা আদৌ থাকবে কিনা, তা নিয়েই সংশয়। আস্তে আস্তে জেডিইউ-কে কার্যত গিলে ফেলবে বিজেপি। এটাই তাঁদের রাজনৈতিক কৌশল।

গত কয়েক মাস ধরেই নীতীশ কুমার অসুস্থ ছিলেন। অসংলগ্ন কথা বলছিলেন। আচরণও স্বাভাবিক ছিল না। বলা যায়, মাথা উঁচু রেখেই সরে গেলেন। এছাড়া তাঁর সামনে আর কোনও উপায়ও ছিল না। সবাইকেই একটা সময় নেতৃত্বের রাশ তুলে দিতে হয়। নীতীশবাবুকেও সরে দাঁড়াতে হল। তবে জঙ্গলরাজের বিহারকে সুশাসনের রাস্তায় আনার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাতেই হবে।

গঙ্গারাম নেহাতই সুপাত্র, সব তাঁর ‘হাপিটেবিটে’ আছে

স্বরূপ গোস্বামী

তিনি যেমন-তেমন মানুষ নন, তাঁর ‘হাপিডেবিটে’ সবকিছুই নাকি লেখা আছে। তিনি মাধ্যমিক পাস করেছেন কিনা, কোনও উত্তর তিনি দেবেন না। কোন বছর, কোন স্কুল থেকে, কিছুই তিনি বলবেন না। সব তাঁর ‘হাফিডেবিটে’ আছে।

একসময় দাবি করতেন, তিনি ক্যালিফর্নিয়া ইউনিভার্সিটির ডক্টরেট। শুধু দাবি করতেন না, নির্বাচনী হলফনামাতেও লিখেছিলেন। কোন বিষয়? সেটা তাঁর ‘হাবিডেবিটে’ আছে। এখন অবশ্য আর বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলেন না। ‘শুদ্ধ দেশি রোমান্স’য়ে

তিনি অনুপ্রাণিত। তাই এখন বলেন কামরাজ ইউনিভার্সিটির কথা।

এই 'কীর্তিমান' বিহারের নতুন মুখ্যমন্ত্রী। সাম্প্রতিকতম নাম 'সম্রাট চৌধুরি'। 'সাম্প্রতিকতম' শব্দটা ব্যবহার করতে হল, কারণ ইতিপূর্বে বহুবার তিনি নাম বদল করেছেন। জেল খাটার আগে এক নাম, জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর আরেক নাম। সেই নাম পোষাচ্ছিল না বলে আরও অন্য নাম। এখন তিনি সম্রাট চৌধুরি। কী জানি, কোনদিন এই নামটাও হয়তো বদলে ফেলবেন।

তিনি কোন দলের? এখানেও সেই জটায়ুর 'সাম্প্রতিকতম উপন্যাস' এর মতো 'সাম্প্রতিকতম' শব্দটাই ব্যবহার করতে হবে। কারণ, বহু ঘাটের জল খেয়ে এখন তিনি বিজেপিতে ভিড়েছেন। কখনও কংগ্রেস, কখনও আরজেডি, কখনও জেডিইউ। 'ভুবন ভ্রমিয়া শেষে' তিনি নোঙর গেড়েছেন ভাজপার নতুন বন্দরে। একসময় জেদ ধরে মাথায় পাগড়ি পরে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন, যতদিন না মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে নীতীশ কুমারকে সরাতে পারছি, ততদিন মাথার পাগড়ি খুলব না। রাজনীতির কী অদ্ভুত পরিহাস! নীতীশ কুমার আবার এনডিএ শিবিরে এসে গেলেন। আর তিনি হয়ে গেলেন সেই নীতীশ কুমারের ক্যাবিনেটের মন্ত্রী। এমনকী, একসময় উপমুখ্যমন্ত্রী। সেইসঙ্গে, বাজেট বইয়ের একটি পাতাও রিডিং পড়তে পারুন বা নাই পারুন, তিনি হলেন অর্থমন্ত্রী। বেচারাকে মাঝপথেই পাগড়ি খুলতে হল। আর যখন তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসলেন, নীতীশ কুমারই কিনা তাঁর নামের প্রস্তাবক!

আচ্ছা, তাঁর বয়স কত? মেয়েদের বয়স জিজ্ঞেস করতে নেই। তিনি আর যাই হোক, মহিলা নন। অতএব জিজ্ঞেস করাই যায়। কিন্তু বয়স জিজ্ঞেস করলেও তিনি বেজায় রেগে যান। বলে বসেন, সেটাও নাকি 'হাফিডেবিটে' আছে। ব্যাপারটা কী? আসলে, খুনের মামলায় যখন

জেলে গিয়েছিলেন, তাঁকে বাঁচাতে দারুণ একটা ফন্দি ফেঁদেছিলেন তাঁর উকিল মশাই। তিনি কোত্থেকে একটা সার্টিফিকেট এনে কোর্টে জমা দিয়ে বললেন, হুজুর আমার মক্কেল নেহাতই নাবালক। ওর বয়স সবে পনেরো বছর। অতএব জুভেনাইল আইনে তাকে ছাড় দেওয়া হোক। বিচারকের সাদা মনে কাদা নেই। দামড়া লোকটিকে চোখের সামনে দেখেও বিচারকের মনে হল, বেচারা সত্যিই নাবালক। অতএব ছাড়া পেলেন।

এই পর্যন্ত ঠিক ছিল। কিন্তু কয়েক বছর পরেই এই মহামানবের ইচ্ছে হল, ভোটে দাঁড়াবেন। কিন্তু ভোটে দাঁড়াতে গেলে তো অন্তত পঁচিশ বছর বয়স হতে হবে। এদিকে, তিনি তো কয়েক বছর আগে পনের বছর বলে ছাড়া পেয়েছেন। অতএব তিনি আবির্ভূত হলেন অন্য নামে। বয়সটাও একলাফে এগারো বছর বেড়ে গেল। এসবের পিছনে সম্রাটের বুদ্ধি তেমন কাজ করেনি। তাঁর বাবার নাম শকুনি চৌধুরি। তিনিও নানা ঘাটের জল খেয়ে বিধায়ক, সাংসদ হয়েছেন। যথার্থই শকুনির মতো বুদ্ধি। ফলে, বয়স কমানো, বয়স বাড়ানো, নামবদল, দলবদল— সবই সেই শকুনির পাশা।

সম্রাটবাবুর বর্ণময় জীবনে এত ঘটনার ঘনঘটা, কেন যে তাঁকে নিয়ে বায়োপিক হয় না! বলুন তো, কোনও বলিউডি ছবিতে চিত্রনাট্যে এতরকম বাঁক আছে! বলিউডি পরিচালকরা না বুঝলেও তাঁর এই প্রতিভার কথা অন্তত মোদিবাবু, অমিত শাহরা বুঝেছেন। একেবারে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসিয়ে দিয়েছেন। বিহার হলই না হয় নালন্দা, বিক্রমশীলার রাজ্য। হলই না হয় আর্যভট্ট বা চাণক্যর রাজ্য। সেই রাজ্যের বর্তমান অধিপতির সব কীর্তি হাপিডেবিটে আছে।

আজ থেকে ৫৪ বছর আগে, এনআইটি পাটনা থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বেরিয়েছিলেন নীতীশ কুমার। কেন্দ্রে কৃষি, ভূতল পরিবহণ, রেলের মতো দপ্তর সামলেছেন। দুই দশকের বেশি সময় ধরে মুখ্যমন্ত্রী। বিহারে তাঁর চলতি নাম ‘সুশাসনবাবু’। তাঁর বদলি এমন একজন, যিনি মাধ্যমিক পাস করেছেন কিনা বলতে পারেন না। অথচ, হলফনামায় কী অবলীলায় পিএইচডি লিখে ফেলেন! সব তাঁর হাপিডেবিটে আছে। এমন গঙ্গারামকে পাত্র হিসেবে যখন পেয়েই গেছেন, তখন সে কেমন ছেলে, নাইবা জানতে চাইলেন!

কেউ কারও ডিগ্রি নিয়ে প্রশ্ন তোলে না

বিপ্লব মিশ্র

মনোনয়ন জমা পড়লেই প্রার্থীদের সম্পর্কে নানা তথ্য সামনে আসছে। তার কিছু কিছু বিষয় গণমাধ্যমেও উঠে আসছে। তবে জরুরি বিষয়গুলির থেকেও অবান্তর বিষয় যেন বেশি করে জায়গা পাচ্ছে। কত গ্রাম গয়না আছে, স্ত্রীর নামে কত গ্রাম গয়না আছে, তা ফলাও করে লেখা হচ্ছে। অথচ, প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতার দিকটা উহ্য থেকে যাচ্ছে।

আমার মনে হয়, গণতন্ত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার

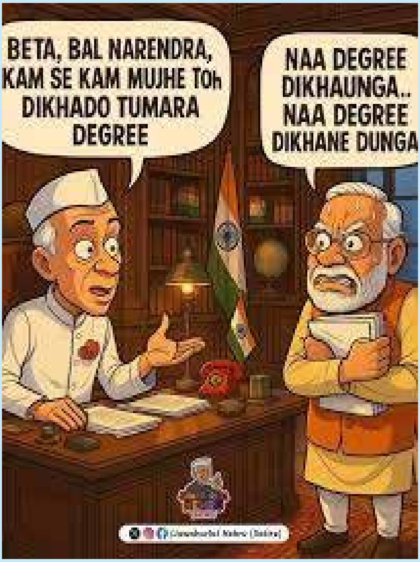

উল্লেখটা খুব জরুরি। কে কতদূর লেখাপড়া করেছেন, সেটা ভোটারদের জানা উচিত। অন্তত কার কত গ্রাম গয়না আছে, তার থেকে শিক্ষা কতটা আছে, এটা জানা অনেক বেশি জরুরি। কার কী ডিগ্রি, সেটাই তাঁর যোগ্যতার একমাত্র মানদণ্ড নয়। কেউ এম এ পাস করলেই মানেই তিনি বিরাট শিক্ষিত, এমনটাও নয়। কিন্তু এই সময়ে দাঁড়িয়ে যদি কেউ মাধ্যমিক পাসও না হয়ে থাকেন, তাহলে সেটা সত্যিই উদ্বেগের। আচ্ছা, এমন মানুষ কি সত্যিই দেশের বা সমাজের বিরাট কোনও উপকার করতে পারবেন?

বিধানসভা বা লোকসভাকে বলা হয় আইনসভা। অর্থাৎ, সেখানে আইন তৈরি হয়। যাঁরা আইন তৈরি করছেন, যাঁরা সংবিধান সংশোধন করছেন, তাঁদের ন্যূনতম শিক্ষাটুকু থাকবে না? কোন আইন তৈরি হচ্ছে, কোন আইনের পরিবর্তন হচ্ছে, এটুকু বোঝার মতো বিদ্যেটুকুও যদি না থাকে, এমন মানুষদের আইনসভায় পাঠানো কি খুব জরুরি?

অনেকেই আছেন, শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে মিথ্যে তথ্য দেন। কারণ, তাঁরা জানেন, এইসব বিষয় নিয়ে তদন্ত হবে না। এর জন্য সদস্যপদ খারিজও হবে না। যেমন, আমাদের প্রধামন্ত্রীর কথাই ধরা যাক। তিনি এমন একটি বিষয় নিয়ে এমএ করেছেন, যে বিষয়টি পৃথিবীর কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোই হত না। তাঁর কোনও সহপাঠী নেই। কোনও জুনিয়র নেই, কোনও সিনিয়র নেই। এমন কৃতী ছাত্রের কোনও শিক্ষক নেই। কেউ প্রশ্ন তুললেই সলিসিটর জেনারেল দাঁড়িয়ে পড়েন। সেই বছরের কোনও পরিসংখ্যান নাকি দেওয়া যাবে না। আদালতও মরিয়া হয়ে পড়ে এই কেলেঙ্কারি ধামাচাপা দিতে। অথচ, প্রধানমন্ত্রীর এই ডিগ্রি কেলেঙ্কারি নিয়ে অদ্ভুত নীরব তৃণমূল। কারণ, তাঁর ডিগ্রি নিয়ে প্রশ্ন তুললে কোনও এক যুবরাজের ডিগ্রি নিয়েও টান পড়বে। যিনি বেমালুম নিজেকে এমবিএ বলে দাবি করেন। অথচ, সেই ডিগ্রির কোনও বৈধতাই নেই। কী আশ্চর্য! বিজেপি এত বিষয় নিয়ে সোচ্চার। অথচ, সেই যুবরাজের ডিগ্রি নিয়ে কথা বলতে দেখা যায় না। কারণ, তাঁরাও জানেন, যুবরাজের ডিগ্রি নিয়ে প্রশ্ন তুললে মোদি বিপদে পড়ে যাবেন। কী অদ্ভুত এক বোঝাপড়া।

নির্বাচন কমিশনের কাছে অনুরোধ, কেউ হলফনামায় শিক্ষাগত যোগ্যতার যে দাবি করছেন, তার স্বপক্ষে উপযুক্ত নথিও জমা দিতে বলা হোক। ভোটার তালিকায় নাম তুলতে গ্রামের সাধারণ গরিব মানুষকে এতরকম নথি দিতে হচ্ছে। আর যিনি নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন, তাঁর কাছে ওই সামান্য নথিটুকু চাওয়া যাবে না? কোনও অভিযোগ এলে সেই নথির পরীক্ষা হোক। প্রয়োজনীয় তদন্তের পর যদি দেখা যায়, ওই দাবি ভুয়ো, তাহলে তাঁর বিধায়ক বা সাংসদ পদ খারিজ করা হোক। দাবি তোলাই সার। এটাও জানাই আছে, কাজের কাজ কিছুই হবে না। আমাদের দেশের নির্বাচন কমিশন এতখানি সাবালক হয়নি। অদূর ভবিষ্যতে হবে, এমন সম্ভাবনাও নেই।

মশাই, কদিন হাসপাতালে বা শ্মশানে গিয়েছেন?

সরল বিশ্বাস

দেখতে দেখতে আরও একটা নির্বাচন এগিয়ে আসছে। যথারীতি, উঠে আসছে সেই চেনা প্রশ্নটা? এবার কি শূন্য দশা কাটবে? এবার কতগুলো আসন কাটতে পারে? অতি আশাবাদীরা অবশ্য এত অল্পে সন্তুষ্ট নন। তাঁদের দিবাস্বপ্নের বিরাম নেই। ‘মানুষ সব সেটিং ধরে ফেলেছে, এবার লাল পতাকা উড়ছেই।’

বৃথা আশা মরিতে মরিতেও মরে না। ২০১৯, ২০২১, ২০২৪ — তিনটি বড় মাপের নির্বাচনেই শূন্যতা কাটেনি। এত তাড়াতাড়ি সেই শূন্য দশা কেটে যাবে, এমন আশা না করাই ভাল। শূন্যতা

কাটলেও বিরাট আসন এসে যাবে, এমনটা ভাবারও কোনও কারণ নেই। আসন সংখ্যা হয়তো এক অঙ্কেই আটকে থাকবে। তৃণমূলের বিকল্প বিজেপি— বিরাট অংশের মানুষ এখনও এই তত্ত্বেই বিশ্বাস করেন। তাঁদের ভাবনা ঠিক হোক, ভুল হোক, তাঁরা যে এমনটা ভাবছেন, এটা ঘটনা। এখনই বামের পালে হাওয়া লাগবে, এমন দুরাশা না করাই ভাল।

বামেরা তাহলে কী করলে ঘুরে দাঁড়াবে? অনেকেই এমনটা জানতে চান। সত্যি কথা বলতে কী, এর চটজলদি কোনও সমাধান সূত্র নেই। তিন থেকে একধাক্কায় একে উঠে আসার নজির ভারতীয় রাজনীতিতে তেমন একটা নেই। মনে রাখতে হবে, ২০১১-তে মানুষ শুধু তৃণমূলকে আনেনি, বামেদের প্রত্যাখ্যানও করেছিল। দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত একটা ক্ষোভ ব্যালট বাক্সে ঝড় তুলেছিল। তৃণমূলের ওপর কি ক্ষোভ তৈরি হয়নি? হয়তো আরও বেশি ক্ষোভ, আরও বেশিই মোহভঙ্গ হয়েছে। কিন্তু এখনই তৃণমূলকে প্রত্যাখ্যানের জায়গায় আমজনতা আসেনি। বা তৃণমূলকে প্রত্যাখ্যান করলেও আপাতত তার সুবিধা বামেরা পাবে না।

কেউ কেউ ধরে নিয়েছেন, এসআইআর হলে অনেক ভুয়ো ভোটার বাদ যাবে। তাহলেই তৃণমূল বোধ হয় জব্দ হয়ে যাবে। কিন্তু এতে তৃণমূলের যত না ক্ষতি হয়েছে, হয়তো লাভ হয়েছে তার থেকে বেশি। অনেকে ভেবেছিলেন, ভোটের আগে সিবিআই, ইডি তেড়েফুঁড়ে নামবে। তাতে অনেকেই ফাটকের ওপারে চলে যাবে। এত মাস, এত বছর পেরিয়ে গেল। এখনও নির্মম সত্যিটা বুঝতে এত দেরি? সিবিআই, ইডি যে আস্ত একটি কাঁচকলা প্রসব করবে, এটা বুঝেও বোঝেন না! ভোট তো এসেই গেল। যথারীতি তাঁরা সেই কাঁচকলাই প্রসব করল। আসলে, বামেরা এত বছর ধরে সেটিং-সেটিং চিৎকার করে আসছেন, এই শব্দটা বড়ই ক্লিশে হয়ে গেছে।

বলা হয়, বামেদের আরও রাস্তায় নামতে হবে। আন্দোলন করতে হবে। কিন্তু সেসব করতে তো বড় মাপের সংগঠন লাগে। মানুষকে একত্রিত করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু ছোট ছোট সামাজিক কাজ তো করা যায়। বামেরা কি সেইসব সামাজিক কাজে নিজেদের যুক্ত রাখছেন? এটা অনেক বেশি জরুরি। আচ্ছা, আপনি কাউকে রক্ত দিতে গেলে তৃণমূল বা পুলিশ নিশ্চয় বাধা দিতে আসবেন না। সারা জীবনে কজনকে রক্ত দিয়েছেন? শিবিরেই বা কবার দিয়েছেন? হাসপাতালে গিয়েই বা কজনকে দিয়েছেন। গোটা জেলা কমিটি ধরে যদি সমীক্ষা হয়, দেখা যাবে,

মিডিয়ায় সেই ছবি ছাড়ার তাগিদটাও বেশ ভালমতোই লক্ষ্য করা গেছে। সত্যিকারের মানুষের পাশে থাকলে ঢাক পেটানো কি সত্যিই খুব জরুরি? মানুষকে জানান দেওয়া কি খুব জরুরি? এতে যাঁর পাশে দাঁড়ালেন, তাঁকে কি কোথাও ছোট করা হল না? তাঁর কৃতজ্ঞতা বিরক্তিতে বদলে গেল না তো?

কারও জন্য হাসপাতালে গেলে, তাঁর পরিবারের লোকেরা ঠিকই জানবেন। একসময় পাড়াপড়শিও জানবেন। এর জন্য চটজলদি ছবি আপলোড করার কোনও দরকার নেই। বরং তাতে হ্যাংলামিটাই আরও বেশি করে বেআব্রু হয়। ছবি তোলার হ্যাংলামো আর ফেসবুকের মোহ যত তাড়াতাড়ি কাটিয়ে উঠতে পারবেন, ততই মঙ্গল। আগে এক ঘণ্টা ফোন ছেড়ে থাকা প্র্যাকটিস করুন। চেষ্টা করে দেখুন তো, পারেন কিনা। যদি না পারেন, তাহলে বুঝে নিন আপনি কারও কোনও কাজেই আসবেন না।

সব পাড়াতেই অনেক বয়স্ক মানুষ থাকেন। যাঁদের ছেলে হয়তো বাইরে থাকেন। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। বুড়ো বুড়ি সারাদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। আপনার চেনা জানার বৃত্তেও এমন মানুষের অভাব নেই। মাসে কবার এমন মানুষদের বাড়িতে যান! টুকটাক এটা–সেটা এনে দেওয়া, নিদেনপক্ষে তাঁদের গল্প শোনা— এটুকু তো করাই যায়। আমরা আদৌ করি কি?

সবাই সবকিছু বোঝে। কাউকে কিছু বোঝাতে যাবেন না। আপনি যেটা ফেসবুক দেখে জেনেছেন, সেই মানুষটা সেটা জেনেছেন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে। রাস্তায় নামা, গণ আন্দোলন গড়ে তোলা। এগুলো তো অনেক বড় ব্যাপার। আগে এই ছোট ছোট কাজগুলো শুরু হোক। শূন্যের গেরো এমনি এমনি কাটবে না। কাজটাও সেই শূন্য থেকেই শুরু করতে হবে।

অনেকে একবারও দেননি। অনেকে একবার, মেরেকেটে দু'বার। অথচ, পঞ্চাশ বছরের এক কর্মী বা নেতা চাইলে পঁচিশ থেকে তিরিশবার দিতে পারতেন। জেলা কমিটিতে এমন একজনকেও কি খুঁজে পাওয়া যাবে?

আত্মীয়দের জন্য বা শ্বশুরবাড়ির লোকের জন্য অনেককেই হাসপাতালে যেতে হয়। তার বাইরে! পাড়া পড়শি হোক বা বন্ধু, পার্টি কমরেড হোক বা পাশের গ্রামের মানুষ। এঁরা যখন হাসপাতালে ভর্তি থাকেন, আমরা কজন তাঁদের দেখতে যাই। কজন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছি? কেউ মারা গেলে গত দশ বছরে কবার শ্মশানে গেছি? যদিও বা যাই, কতক্ষণে ফেসবুকে সেই ছবি ছাড়ব, তার জন্য প্রাণ ছটপট করে। তারপর কটা লাইক আর কমেন্ট পড়ল, গুনতে থাকি।

শিক্ষকদের অনেকেই বাম মনস্ক। অনেকে শিক্ষকতার পাশাপাশি চুটিয়ে টিউশনিও পড়ান। কজন দুঃস্থ ছাত্রকে বিনা মাইনেতে পড়ান? পঞ্চাশজনের ব্যাচে যদি পাঁচজনকে বিনা বেতনে পড়ান, নিশ্চয় তৃণমূল ডান্ডা নিয়ে আপনার বাড়িতে হামলা করবে না। যদি কয়েকজন শিক্ষক মিলে একটা অবৈতনিক বা স্বল্পমূল্যের কোচিং সেন্টার চালান, মনে হয় না পুলিশ এসে আপত্তি করবে। গোটা বাংলায় এমন কটা কোচিং সেন্টারের উদাহরণ আছে?

অনেকে বলবেন, রেড ভলান্টিয়ারদের কথা। হ্যাঁ, করোনা কালে বাম ছাত্র যুবদের ভূমিকা সত্যিই প্রশংসনীয় ছিল। কিন্তু তার ধারাবাহিকতা আর রইল না। তাছাড়া, যাঁরা পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই সোশ্যাল

এই উপেক্ষা কি আশাজির প্রাপ্য ছিল!

বৃষ্টি চৌধুরি

হাতে থাকা ছোট্ট এই যন্ত্রটা মানুষকে কতটা বিচ্ছিন্ন করে তুলছে। দুজন দুজনের পাশে বসে আছে। অথচ, কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না। আমি, আপনি সকলেই এমন ছবির সঙ্গে পরিচিত। তেমনই একটা ছবি কয়েক বছর আগে ভাইরাল হয়েছিল। যার–তার শেয়ার করা ছবি নয়। স্বয়ং আশা ভোসলে এই ছবিটি শেয়ার করেছিলেন।

আশাজির প্রয়াণের পর বারবার এই করুণ দৃশ্যটার কথাই মনে পড়ছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পুরনো সেই ছবিটাও পাওয়া গেল। কথায় আছে, একটা ছবি হাজার শব্দের সমান। এই ছবিটাও

তেমনই। অনেক কথাই বলে দিয়ে যায়। কিংবদন্তি গায়িকা এসেছিলেন উত্তরবঙ্গে। একটি গানের অনুষ্ঠানে। বাগডোগরা বিমানবন্দ থেকে কলকাতা হয়ে মুম্বই ফিরে যাওয়ার কথা। আশাজির সঙ্গে তাঁর যন্ত্রশিল্পীরাও এসেছিলেন। এয়ারপোর্টের ভিআইপি লাউঞ্জে বসানো হয়েছিল তাঁদের।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে, সবাই নিজের মোবাইল নিয়েই বয়স্ত। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছেন না। কেউ কারও দিকে তাকাচ্ছে না। আর অবাক বিস্ময়ে বাকি চারজনের দিকে তাকিয়ে আছেন আশাজি। ভাবতেও অবাক লাগে, পাশে আশা ভোসলের মতো কিংবদন্তি বসে আছেন। অথচ, কারও মধ্যে কোনও হেলদোল নেই! কারও মনে কোনও রোমাঞ্চ নেই! সবাই মোবাইল ঘাঁটছেন!

অথচ, যে চারজনকে দেখা যাচ্ছে, তাঁদের মধ্যে একজন মোটমুটি পরিচিত শিল্পী। বাকিরাও আশাজির সঙ্গে থাকা যন্ত্রশিল্পী। তাঁদের যেটুকু সামাজিক স্বীকৃতি, তার অনেকটাই আশাজিকে ঘিরে। এই শিল্পীরা তিরিশ বছর পরেও হয়ত গর্ব করে বলবেন, আশাজির সঙ্গে বাজিয়েছি। এই ছবিগুলোই হয়ত বাড়িতে টাঙিয়ে রাখবেন। আশাজির প্রয়াণের পর তাঁরাই হয়তো লম্বা লম্বা ইন্টারভিউ দিচ্ছেন। এমনকী এই যে মোবাইল নিয়ে এত খুচুর খাচুর, খোঁজ নিলে দেখা যাবে, যত ছবি শেয়ার করেন, তার অধিকাংশই আশাজির সঙ্গে তোলা। আশাজির সঙ্গে ঘুরছেন, এটাই হয়ত তাঁদের ইউএসপি। তাঁদের নিজেদের ছবিতে কটা লাইক বা কমেন্ট পড়ে, ঘোর সন্দেহ। আশাজির সঙ্গে থাকা ছবিগুলোর জন্যই বন্ধুমহলে, পরিচিত মহলে গুরুত্ব পান। আগামীদিনেও এটাকে ভাঙিয়েই তাঁরা বেঁচে থাকবেন।

অথচ, সেই আশাজি পাশে বসে ছিলেন। এই কীর্তিমানদের কোনও ভ্রুক্ষেপই ছিল না। এঁরা আপন আপন খেয়ালে মোবাইল–চর্চা করেই চলেছেন। স্বয়ং আশাজির মনের অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করুন। হয়ত মনে মনে ভাবছিলেন, এ কোন অর্বাচীনদের সঙ্গে এলাম। আমি পাশে বসে আছি, অথচ এরা মোবাইল ঘেঁটেই চলেছে! হয়ত ভাবছিলেন, কী জানি, অনুষ্ঠানের সময় শ্রোতারাও হয়ত এমনটাই করেন। আমরা হয়ত ফুরিয়ে যাচ্ছি। আমাদের উপস্থিতি হয়ত আর আগের মতো মানুষের কাছে কাম্য নয়।

স্বয়ং আশাজিকে যদি এমন উপেক্ষার শিকার হতে হয়, ঘরে ঘরে বন্দি থাকা হাজার হাজার বৃদ্ধ বাবা–মায়ের কথা একবার ভাবুন। এমনিতেই তাঁরা কত একা। সন্তান ঘরে থাকলেও হয়ত মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত। তাঁদের ছবি কোথাও ছড়িয়ে পড়বে না। এই উপেক্ষা নিয়েই হয়ত তাঁদের বেঁচে থাকতে হবে।

নাইটদের ঘিরে এত আদিখ্যেতা কীসের?

অজয় নন্দী

যাই যাই বসন্তের আবহে হাজির আইপিএল। দু'মাস ধরে সন্ধেবেলায় নিয়ম করে ক্রিকেটের মহাযুদ্ধ। শুধু কি ক্রিকেটের মহাযুদ্ধ। রিমোটের কন্ট্রোল কার হাতে থাকবে, তা নিয়েও কি ঠান্ডা লড়াই হবে না! বাড়ির বউ চাইছেন সিরিয়াল দেখতে। কিন্তু কর্তা বা ছেলের পছন্দ আইপিএল। এদিকে, বাড়িতে একটাই টিভি। তাই সন্ধেয় সিরিয়াল না আইপিএল?

কয়েক বছর আগেও সন্ধেবেলায় এটা নিয়েই চলত নানা টানাপোড়েন। কিন্তু এখন সবার হাতেই স্মার্ট ফোন। কেউ আর টিভি নির্ভর নয়। মা যদি টিভিতে সিরিয়াল দেখতেও চায়, ছেলে কোনও না কোনও অ্যাপ ইনস্টল করে ঠিক

আইপিএল দেখে নেবে। বলা যায়, একটা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।

আমি বাঙালি। যুক্তি অনুযায়ী, আমার কলকাতা নাইট রাইডার্সেরই সমর্থক হওয়ার কথা। কিন্তু কেন জানি না, নাইট রাইডার্সের প্রতি সেই আকর্ষণ কখনই অনুভব করি না। একমাত্র সৌরভ গাঙ্গুলি যতদিন অধিনায়ক ছিলেন, তখন কিছুটা হলেও নাইটের সমর্থক ছিলাম। তারপর থেকে নাইট জিতল না হারল, তা বিশেষ রেখাপাত করে না। নাইট হারলে রাগও হয় না, দুঃখও হয় না। বা জিতলেও বিরাট কোনও আনন্দ হয় না। বরং, চেন্নাই জিতলে অনেক বেশি আনন্দ পাই। এমনকী গতবার মনে প্রাণে চেয়েছিলাম, এবার বিরাট কোহলির দল চ্যাম্পিয়ন হোক। ১৮ বছর ধরে একই দলের হয়ে খেলছেন। ভারতীয় ক্রিকেটের মহাতারকার মুকুটে কোনও আইপিএল ট্রফি থাকবে না? তাই আগেরবার বেঙ্গালুরু চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় বেশ ভালই লেগেছিল।

মাঝে মাঝেই ভাবি, বাংলাকে এত ভালবাসি, কলকাতাকে এত ভালবাসি। তাহলে আইপিএলে চ্যাম্পিয়ন হলে সেই আনন্দ হয় না কেন? কলকাতা হারলেই বা দুঃখ হয় না কেন? আসলে, কলকাতার এই দলটাকে ঘিরে কখনই সেই একাত্মতা তৈরি হয়নি। আমার মতো অনেকেই দেখেছি কেকেআর সম্পর্কে নিস্পৃহ, উদাসীন। কেন আমাদের মধ্যে এই উদাসীনতা তৈরি হল, নাইট ম্যানেজমেন্ট ভেবে দেখুন।

বেঙ্গল টাইমস

২১ এপ্রিল, ২০২৬

মিছিলের সেই মুখ

ISSN 2445 5657

bengaltimes.in